নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০০ ❑ প্রথম বর্ষ ❑ ষষ্ঠ সংখ্যা ❑ ১০ টাকা

মন্থন

সাময়িকী

তিনটি পরমাণু-বিষয়ক পুস্তক পর্যালোচনা ঃ
● এ বিশ্বকে বাসযোগ্য করার লক্ষ্যে পৃ-২

সাক্ষাৎকার ঃ
● সাম্প্রদায়িকতা, কৌম, জাতীয় রাষ্ট্র এবং নাগরিক সমাজ পৃ-৩
দরাপ খাঁ গাজী [রচনাংশ] পৃ-৭

এদেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা
—— এক বিপন্ন ইতিহাস পৃ-৮

গল্প ঃ
● চিংড়িপোতার মেয়ে, বদরতলার ছেলে পৃ-১০
● একটা মসজিদ এবং কিছু মানুষ পৃ-১৪

কবিতা ঃ
● লড়াই পৃ-১৪

দর্জি সমাজের একটা চিত্র ও একটা সমস্যা পৃ-১২
দর্জিদের দুরবস্থা পৃ-১২
এই বেশ আছি পৃ-১৫
মেটেবুরুজের সাম্প্রদায়িকতা পৃ-১৬
মেটিয়াব্রুজের কৌমজীবন পৃ-১৭
আসগর আলি ইঞ্জিনীয়ার এবং মুসলমান সমাজে একটি আদর্শ নিকাহ্‌নামার জন্য লড়াই পৃ-১৯

পুস্তক পরিচিতি ঃ
● ভারতবর্ষের মুসলমান নারী সমাজ পৃ-২০
● কয়েকটি সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ক গ্রন্থ পরিচিতি পৃ-২৩
● ধর্ম এবং ধর্মনিরপেক্ষতার সংলাপ কেন জরুরি পৃ-৩৪

সিনেমায় ভারতীয় মুসলিমের আত্মপরিচয় ঃ মিশন সম্প্রীতি পৃ-২৫
বাঙালি মুসলমানের লোকাচার পৃ-২৭
পশ্চিমবঙ্গের বন্যা ঃ ২০০০ পৃ-৩৫
সংবাদমন্থন ঃ পৃ-৪০

১ কৌন বনেগা ক্রোড়পতি ?
২ অসফল ডাক ধর্মঘট
৩ কলকাতার নাটক এবং তিস্তাপারের আন্দোলন
৪ হৃতিক রোশন এবং বিক্ষুব্ধ নেপাল

সম্পাদকের কথা

২০০০ সালের সর্বশেষ সংখ্যা বেরোতে দেরি হল। সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, জাতীয় সংহতি ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলি বারবারই এসে পড়ছে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে। হঠাৎ যখন দেখি, ঈদের দিন সকালে নামাজ পড়ে, দলে দলে মানুষ বুকে তেরঙ্গা পতাকা আঁকা 'ঈদ মুবারক' ব্যাজ এঁটে রাস্তায় বেরিয়েপড়েন, কিংবা মাথায় তেরঙ্গা পতাকা আঁকা টুপি পড়েন; যখন দেখি দুর্গাপুজোর প্যাণ্ডেলে 'কার্গিল যুদ্ধ বিজয়' সাজসজ্জার বিষয় হয়ে ওঠে — বোঝা যায় পরিস্থিতির বদল হয়েছে। এ-বদলের রকমসকম আর ভালমন্দ নিয়ে চর্চা কিছুটা গুরুত্ব পেয়েছে এবারের সংখ্যায়। গুরুত্ব পেয়েছে ধর্ম, ধর্মনিরপেক্ষতা, লোকাচার, লোককাহিনী, কৌমজীবন, শ্রেণীস্বার্থ এবং ইতিহাস-প্রসঙ্গের চর্চা।

সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে চর্চা করতে গিয়ে একাধিক লেখায় এসেছে 'কৌম'-প্রসঙ্গ। হিন্দী ও উর্দু কথাবার্তায় 'কৌম' বা 'কওম' শব্দ চালু রয়েছে। বাংলায় 'কৌম' কথাটি তেমন চালু নয়। ইংরেজি 'কমিউনিটি' ও 'সোসাইটি' কথাদুটির অর্থ বাংলায় অনেক সময় 'সমাজ' করা হয়ে থাকে। পত্রিকায় 'কমিউনিটি' অর্থে 'কৌম' শব্দটি বেশি ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে, মেটিয়াব্রুজ অঞ্চলের জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক নিয়ে কয়েকটি লেখা প্রকাশ করা হল। 'চিংড়িপোতার মেয়ে, বদরতলার ছেলে' গল্পটি থেকে 'মেটিয়াব্রুজের কৌমজীবন' প্রবন্ধ পর্যন্ত সবকটি লেখা মেটিয়াব্রুজ-প্রসঙ্গের। এই অংশটির সংকলন সহ সমগ্র সংখ্যাটি সম্পাদনার কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন মেটিয়াব্রুজ মুদিয়ালী লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক শ্রী বি. কে. গোস্বামী, শ্রী সমীর ঘোষ, বদরতলা পাবলিক লাইব্রেরির সম্পাদক শ্রী অনিল কুমার ভুঁইয়া, গ্রন্থাগারিক শ্রী রবীন্দ্রনাথ দাস,'মৌ' পত্রিকার সংগঠক শ্রী কাশীনাথ ঘোষ এবং বন্ধু শ্রী নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়।

হয় তা হলে মেটেবুরুজে (হয়ত অন্যান্য এলাকাতেও) এক শ্রেণীর মুসলমান নানাভাবে তাদের উল্লাস প্রকাশ করে থাকে, কিন্তু ভারত বিজয়ী হলে অনুরূপ উল্লাস প্রকাশ তারা করে না। এ ব্যাপারটা প্রতিবেশী হিন্দুরা ভাল চোখে দেখে না। তাদের পাকিস্তান-প্রীতিকে দেশদ্রোহিতা বলেই হিন্দুরা মনে করে। চরম অসাম্প্রদায়িক হিন্দুর মনও সাম্প্রদায়িক ভাবনায় কলুষিত হয়।

মেটেবুরুজের বাঙালী হিন্দুরা প্রধানত চাকুরীজীবী। স্থানীয় কলকারখানা আর কলকাতা বন্দরই ছিল তাদের রুটিরুজি রোজগারের উৎস। তারা মোটামুটি সুখেই ছিল। কিন্তু তাদের নিরুত্তাপ আর সরল জীবনযাত্রায় ছেদ পড়ে যখন দেশ ভাগ হওয়ার পরে পূর্ববঙ্গের বহু হিন্দু এসে মেটেবুরুজেও বাস করতে থাকে। স্থানীয় কলকারখানার চাকুরীতে পূর্ববঙ্গগত কিছু কিছু লোকও বহাল হতে লাগল। ফলে, চাকুরির ক্ষেত্রে একটা প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি হ'ল বললে ঘটনার অতি সরলীকরণ হয়ে যাবে, বরং বলা উচিত হবে যে একধরণের অসূয়ার শিকার হল স্থানীয় বাঙালিরা। 'বাঙালরা' তাদের অন্নে ভাগ বসাচ্ছে, এই ভাবনা তাদের পেয়ে বসে। ছিন্নমূল মানুষগুলো বাঁচার তাগিদে কল কারখানায় যে কোন কায়িক শ্রমের কাজ করতে থাকে। অনেকে আক্ষরিক অর্থে কুলিগিরিও করতে থাকে। বাঙাল-বিদ্বেষ, বলা বাহুল্য, অশিক্ষিত এবং অল্প শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে কাজ করত। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, কল-কারখানা বা অফিস-আদালতের নানা পদে অবাঙালিরা নিযুক্ত হলে, তারা কিন্তু এসব ক্ষীণদৃষ্টি মানুষের ঈর্ষার কারণ হ'ত না। কারণ তারা ছিল এদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সুখের কথা, বর্তমানে এধরণের সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠী-চিন্তা থেকে উভয় তরফের বাঙালিরা মুক্ত।

সঙ্কীর্ণতা আর সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে লাগাতার বামপন্থী আন্দোলন আর প্রচার অপরিহার্য। মেটেবুরুজ দু'বার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কলঙ্কিত ঠিকই। কিন্তু এর ভিতর দিয়ে কিছু কিছু মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া গেছে, যখন এক সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অপর সম্প্রদায়ের কোন মানুষকে আততায়ীর ছুরি থেকে রক্ষা করেছে। এমন কি, ১৯৯২ সালের দাঙ্গা থামাতে গিয়ে বামপন্থী কর্মীর রক্ত ঝরেছে। মনুষ্যত্ব হারিয়ে দাঙ্গাবাজ সাময়িক উত্তেজনা বশত মানুষ খুন করতে পারে, কিন্তু মনুষ্যত্বকে চিরতরে খুন করতে পারে না। এটা আরও পরিষ্কার হয় যখন দেখা যায় এক কালের চরম সমাজবিরোধী তার সন্তানকে সুনাগরিক করার উদ্দেশ্যে স্কুলে পাঠায়। অভিজ্ঞতার আলোকে সে উপলব্ধি করে তার একদা অনুসৃত পথ তার নিজের সন্তানের জন্য নয়।

মেটিয়াব্রুজের কৌমজীবন

একটি প্রাথমিক অনুসন্ধান

জিতেন নন্দী

যে শতাব্দী বা একশো বছর আমরা সদ্য পেরিয়ে এসেছি, মেটিয়াব্রুজ বলতে আমরা এক শ্রমিকজীবনের হৃৎস্পন্দন সেখানে পেয়েছি। মেটিয়াব্রুজ বলতে শ্রমিক-বসতি। মেটিয়াব্রুজ বলতে আধুনিক বৃহৎ শিল্প, ছোট-মাঝারি কারখানা, কুটির শিল্প আর বন্দর দিয়ে ঘেরা এক শিল্প-শহর। প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার ঘন বসতিপূর্ণ ঘিঞ্জি এলাকায় পাঁচ লক্ষাধিক মানুষের বাস। মেটিয়াব্রুজের বাসিন্দাদের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি বাংলাভাষী। বাংলাভাষীদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি মুসলমান সমাজের মানুষ, বাকি হিন্দু। এক-তৃতীয়াংশের কম উর্দুভাষী। বাকি হিন্দি, ওড়িয়া এবং অন্য ভাষার লোক।

কিন্তু মেটিয়াব্রুজের জন্ম বিগত শতাব্দীর অনেক অনেক আগে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তখনও এদেশে বাণিজ্য করতে আসেনি। জনবসতি আছে বলে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জাহাজগুলি যেখানে যেখানে নোঙ্গর ফেলেছিল, তার মধ্যে ছিল আজকের খিদিরপুর, মেটিয়াব্রুজ, গার্ডেনরীচ অঞ্চল এবং মাচিস কল এলাকা।

সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ তখন সুন্দরবনের অংশ। পরগণা মাগুরার মৌজা মুদিয়ালীতে ২১৭ বৎসর আগে ১১৭০ বঙ্গাব্দে পঞ্চানন্দ দেবের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। পঞ্চাননতলা মন্দির আজও সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ১৬০-১৭০ বছর আগে মুর্শিদাবাদের এক অধিবাসী এম.এ.খন্দকার তাঁর জমিদারী আমলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বদরপীরের মাজার। গঙ্গার পাড় ঘেঁষে বদরতলা গ্রামে আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই মাজার। আজও হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পীড়িত মানুষ প্রার্থনার জন্য সেখানে জড়ো হন। ১৮৪০ সালে খন্দকাররা ঢাকায় চলে গিয়েছিলেন। মাজার সহ বেশ কিছু জমি দানপত্র হিসাবে দিয়ে গিয়েছিলেন শেখ সমীরউদ্দিন ফকিরের কাছে। ফকিরপাড়ার বাসিন্দা তাঁর বংশধররা আজও এই মাজারের রক্ষণাবেক্ষণ করে চলেছেন।

দুরন্ত নদীর সঙ্গে বাঁধা এক কৌমজীবনের স্বাক্ষর বদর পীর ও পঞ্চানন্দ ঠাকুরের আরাধনা-স্থল, সেদিনের বদরতলা, মুদিয়ালী গ্রাম — আজকের গলি-ঘুপচির জাল বেছানো মেটিয়াব্রুজের দুটি পাড়া। মাঝিমাল্লা ও চাষিবাসী দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলায় ইসলাম ধর্ম এসেছিল পীর, গাজী, সুফিদের হাত ধরে। সুফি মতবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল ত্রয়োদশ শতকে। সুন্দরবনে মাঝিমাল্লারা আজও নৌকা ছাড়ার সময় যে পাঁচ পীরের স্মরণ করেন, তার মধ্যে অন্যতম বদর পীর। উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায়, ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামে আনোয়ার থানায় পটতলী গ্রামে মহসীন আউলিয়ার মাজারে জীবিত ছিলেন বদর পীর — মখদুন শাহ্ বদরুদ্দিন বদর আলম বাহিদী।

মেটিয়াব্রুজের সেই আদি কৌমজীবনের বদল হয়েছে বারবার। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আসার পর ইংরেজ ধনীরা এই অঞ্চলে বাড়ি তৈরী করে বসবাস শুরু করেন। সময়টা ছিল ১৭৬৮ থেকে ১৭৮০ সালের মধ্যে। ১৭৮০ সালে কর্ণেল হেনরি ওয়াটসন খিদিরপুরে ডক তৈরি করেন। তাঁর নামানুসারেই খিদিরপুরের ওয়াটগঞ্জ এলাকা। একই সময়ে শুরু হয় সম্ভবত জাহাজ নির্মাণ। কলকাতা বন্দর তৈরি হয়েছিল ১৮৭০ সালে। আর গার্ডেনরীচের জেটিগুলি তৈরি হয় ১৯২৩ সালে। মাঝিমাল্লাদের কৌমজীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল আধুনিক বন্দর-কেন্দ্রীক জীবন। কিন্তু সে জীবনস্রোতও সরলপথে চলল না, বাঁক নিল নতুন নতুন দিকে।

১৮৫৬ সালে অযোধ্যা ইংরেজদের হস্তগত হল। নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ্ এলেন কলকাতায়। ১৮৫৭ সালের মধ্যে নবাব গড়ে তুললেন লক্ষ্ণৌয়ের আদলে নতুন মেটিয়াব্রুজ। গড়ে উঠলো লক্ষ্ণৌ থেকে আগত উর্দুভাষী মুসলমানদের বসতি। উর্দুভাষী, এক ভিন্ন সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ কৌমের সঙ্গে মিলিত হলেন এখানকার গ্রাম্য কৌমজীবনের আদিবাসিন্দারা। ইংরেজ পরিবারগুলি এ অঞ্চল ছেড়ে চলে গেলেন। মেটিয়াব্রুজে তার আগে পর্যন্ত পিদিম জ্বালা মাটির ঘর, মাটির মন্দির, পুকুর, গাছগাছালিতে ভরা বিরাট বাগান। কলকাতা থেকে এখানে আসার একটাই সোজা কাঁচা রাস্তা —যার থেকেই 'কাচ্চি সড়ক' নামকরণ। মেটিয়াব্রুজ নামকরণ মাটির কেল্লা বা বুরুজ

থেকে। কেউ বলেন নদীপথে জলদস্যুদের অত্যাচার যখন চরমে উঠেছিল, তখন তাদের প্রতিরোধ করতে এখানে মাটির কেল্লা বানিয়েছিলেন শায়েস্তা খাঁ। আবার কেউ বলেন, মোগল আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য রাজা প্রতাপাদিত্য দুর্গ তৈরি করেছিলেন। শোনা যায়, বর্তমান মেটিয়াব্রুজের কেন্দ্র থেকে আড়াই কিলোমিটার দূরে আখড়া ফটক (এখন লোকমুখে আক্রাফটক) ছিল নাকি আসল 'মাটির কেল্লা' অঞ্চল। 'আখড়া' বলতে যেখানে সেনাবাহিনী নিজেদের প্রস্তুতি নেয়। 'ফটক' হল কেল্লার ভিতর ঢুকবার প্রবেশদ্বার। অদূরে নদী। এখনও আছে আখড়া-দত্তবাগান, পুরাতন আখড়া, আখড়া স্টেশন। নদী সংলগ্ন বকুলতলা-ফুলতলা, এখন মূলত বস্তী।

নবাব মারা যান ১৮৮৭ সালে। তাঁর তিরিশ বছরের বসবাসকালে মেটিয়াব্রুজ শিল্প-সাহিত্য চর্চার এক নতুন চেহারায় রঙ্গীন হয়ে উঠেছিল। নবাব লক্ষ্মৌতে ফেলে আসা জীবনের স্বপ্নে নতুনভাবে সাজিয়েছিলেন মেটিয়াব্রুজকে। তিনি নিজেও ছিলেন একজন খাঁটি শিল্পী। কিন্তু রাজনীতির টানাপোড়েনে নবাবের মৃত্যুর অল্প সময়ের মধ্যেই বাগিচা-কুঞ্জ-প্রাসাদ সজ্জিত স্বর্গপুরী ধ্বংস হল। অবলুপ্ত হল নবাবী স্বপ্নের মেটিয়াব্রুজ। স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে পড়ে রইল ইমামবাড়া, শাহী মসজিদের মত নামমাত্র নিদর্শনগুলি। মৃত্যুর আগে ওয়াজেদ আলি (কলমী নাম আখতার)-র কবিতায় ফুটে উঠেছিল আসন্ন সঙ্কটের মর্মস্পর্শী আর্তি ঃ

আন্দোহ আলমকা দিলপে ঘেরা হোগা,
আয় বাজম, আজিব হাল তেরা হোগা,
শমা ক্যায়সি, বুঝ জায়েঙ্গি ঘর ঘর কে চেরাগ
চুপ জায়েঙ্গে আখতার তো অন্ধেরা হোগা।

[দুর্ভাবনার জগৎ-ভার হৃদয় ঘিরে রবেই রবে,
হায় সভাসদ, তোমাদেরও আজব হাল তো
হবেই হবে। ঝাড়বাতি কি! নিভবে দেখো ঘরে
ঘরে দীপের বাতি,ডুবলে যদি আখতার তো
জগৎভরা আঁধার রাতি।]

নবাবী স্বপ্ন, বিলাস, শিল্পচর্চা, আমোদ এবং অপমান-হতাশা যেন চারিয়ে গেল মেটিয়াব্রুজের পরবর্তী উর্দুভাষী কৌমের জীবনস্রোতে। সেই জীবনের অঙ্গ হল সদ্য গড়ে ওঠা কুটির শিল্প। লক্ষ্মৌ হতে নবাব-পরিবারের সঙ্গে এসেছিলেন কয়েকজন হেকিম বা ভেষজ চিকিৎসাবিদ। মেটিয়াব্রুজে চালু হল ভেষজ চিকিৎসা এবং স্থাপিত হল 'আত্তারখানা' বা ভেষজদ্রব্য বিপণি। লখনবী পোশাক, তার উপর বিচিত্র বুটি ও লতাপাতা-ফুলের কাজ বা এমব্রয়ডারির চাহিদা থেকে এল সুদক্ষ কারিগরের প্রয়োজন। গড়ে উঠল সূচীশিল্প এবং দর্জি-শিল্প। ঘুড়ি ওড়ানোর নবাবী শখ মেটাতে গড়ে উঠল ঘুড়ি তৈরির শিল্প।

এইসব শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে বেড়ে ওঠে দর্জি-শিল্প। বাঙালি মুসলমান সমাজের মধ্যে মেটিয়াব্রুজের বটতলা অঞ্চল ঘিরে একটি নতুন কৌমজীবন দানা বেঁধে ওঠে। এখানেই দক্ষ দর্জিদের হাতে তৈরি হত পরবর্তী সময়ে ইংরেজ মহিলাদের শৌখিন গাউন। এমনকী বিলাতে ফিরে যাওয়ার পরও সেখান থেকে অর্ডার আসতো মেটিয়াব্রুজে। বটতলার 'কাসেম টেলার্স' খুবই নাম করেছিল। তখন মাপ না নিয়ে গাউন সেলাইয়ের দক্ষ দর্জিও পাওয়া যেত। আজও হিন্দি সিনেমার নায়ক-নায়িকার পোশাক দেখে নতুন ডিজাইনের মাল তৈরির কারিগর এখানে রয়েছেন। ভালো দর্জিরা তাঁদের অধীনে কয়েকজনকে নিয়ে কাজ করতেন দহ্লিজে। তখন তাঁরা হতেন ওস্তাগর। এইভাবে মেটিয়াব্রুজের বটতলাকে ঘিরে একদিকে মহেশতলা, অন্যদিকে বদরতলা পর্যন্ত ঘরে ঘরে তৈরি হল ওস্তাগরদের দহ্লিজ। গত একশো পঁচিশ বছরে তার বিস্তার ঘটেছে বিপুল আকারে।

অন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যমণ্ডিত শিল্প, সূচী শিল্প (লোকমুখে ফুল তোলার কাজ) এবং ঘুড়ি তৈরির শিল্প (লোকমুখে কামানি মজদুরদের কাজ) মূলত উর্দুভাষীদের মধ্যে গড়ে ওঠে। বিশেষত ঘুড়ির কাজ হয় উর্দুভাষী মুসলমান সমাজের বসবাস কয়েকটি পাড়ায়--রামনগর থেকে কাচ্চি সড়কের মধ্যে এই শিল্পগুলির বিশেষত্ব হল পারিবারিক শ্রম। কাজের বিভিন্ন অংশগুলিতে পারিবারিক শ্রমবিভাগ। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জীবনযাত্রাদ্দ সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত কাজ এবং তার বিশেষ ধরণ। মেটিয়াব্রুজের কৌমজীবনকে এক বিশেষ ছাঁদে, বিশেষ খাতে বয়ে নিয়ে গেছে এই শিল্পবিকাশ।

এরপর এলো আধুনিক বৃহৎ শিল্প বা লার্জ-স্কেল ইন্ডাস্ট্রি। গঙ্গার তীরে সমুদ্রযাত্রার বন্দর এই আধুনিক কলকারখানা জীবনের ভিত গড়ে দিয়েছিল বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় প্রথমে এলো চটকল। সাউথ ইউনিয়ন জুট মিল-বদরতলায়। কাচ্চি সড়কে ভিক্টোরিয়া জুট মিল। তারপর সুতাকল। প্রথ স্বদেশী উদ্যোগ। ভারতীয় শিল্পপতি বিড়লার কেশোরাম কটন মিল। এদিকে তৈরি হল পাওয়ার হাউস ও রেলের দপ্তর। তারও আগে জাপানী মালিকানা দেশলাই কারখানা (লোকমুখে মাচিস কল)। তারপর ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প। জাহা নির্মাণ কারখানা -- গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপ। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরির কারখান জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি (জি.ই.সি.), ল্যাম্প তৈরির কারখানা—এর্লা (লোকমুখে বাত্তিকল)। তারপর আধুনিক নিত্যব্যবহার্য পণ্য শিল্প। সাব কারখানা—বৃটিশ লিভার ব্রাদার্স-এর মালিকানায় হিন্দুস্থান লিভার (লোকমু সাবুন কল)। এরপর সিগারেট কল, সিমেন্ট কল ইত্যাদি।

ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকেই খিদিরপুর ও মেটিয়াব্রুজ অঞ্চলে নদীয় বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর থেকে গ্রামের মানুষ এসে ঘর বাঁধতে শু করেছিলেন। চটকল, সুতাকল ইত্যাদি শিল্পের বিশেষ বিশেষ কাজের প্রয়োজ বিশেষ ধরণের দক্ষতার প্রয়োজনে এলেন উড়িষ্যার মানুষ, পরিশ্রমী বিহা উত্তর প্রদেশের হিন্দিভাষী মানুষ। গ্রামের নিজের নিজের কৌমজীবন থে উৎপাটিত হয়ে আসা মানুষকে নিয়ে গড়ে উঠলো নতুন শ্রমজীবী কৌম শ্রমিকশ্রেণীর জীবন। যদিও ফেলে আসা কৌমজীবনের জের চললো। এ এক পাড়ায়, এক এক অংশে সেই পুরানো কৌমজীবনের সংস্কৃতি কিছু আলাদা চেহারা ও মাত্রা নিয়ে মাথা তুলে রইলো। আর ফল্গুধারার মতো নতুন জনপ্রবাহের আনাচ-কানাচ দিয়ে বইতে থাকলো মেটিয়াব্রুজের অ কৌমজীবনের সংস্কৃতি-ধারা।

শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্ঘবদ্ধ জীবন প্রথম আকার নেয় চটকল ও সুতাকে ট্রেড-ইউনিয়ন গড়ার মধ্যে দিয়ে। এরপর রাজনৈতিক জীবন। শ্রমিক সরাসরি অংশগ্রহণে সাম্যবাদী দল গড়ার চেষ্টা মেটিয়াব্রুজে কিছুটা স হয়। ১৯৩০-এর দশকে কমিউনিষ্ট পার্টির কলকাতা কমিটির সাত-আট পরিচালকের মধ্যে দুজন ছিলেন শ্রমিক -- একজন রাজাবাগান কারখান আর একজন বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের (বি.এন.আর.) সদর দপ্তে ওয়ার্কশপের। রাজাবাগানের শ্রমিক ছিলেন পার্টি কমিটির সম্পাদক। বদরত মাঝিমাল্লারা এই বেআইনী দলগঠনের কাজে মদত করেছিলেন। পরের দি দর্জি সমাজের মধ্যেও কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভাব বিস্তার করেছিল। উর্দু অঞ্চলে আজ পর্যন্ত সুতাকল শ্রমিক-নেতা ফারুকীসাহেব অমর হয়ে রয়েছে এছাড়া জনপ্রিয় হয়েছিলেন হিন্দিভাষী নেতা নীরেশ ঠাকুর, ছেদিলাল সি যাঁরা ছিলেন পুরোদস্তুর শ্রমজীবী। সাউথ ইউনিয়ন জুট মিলের শ্রমিকের গুরুদাস পাল অমর হয়ে আছেন গণকবিয়াল খ্যাতি নিয়ে। তাঁর লোকগ বদরতলার গ্রাম্য জীবনের সুর আর কথা মিশে গিয়েছিল শ্রেণীসংগ্রামের শ্রেণীজীবনের বাস্তবতার সঙ্গে।

উনবিংশ শতাব্দীতেই মেটিয়াব্রুজে জনশিক্ষার আকাঙ্খা স্পষ্টভাবে হয়। ১৮৫৬ সালে তৈরি হয় স্থানীয় উদ্যোগে মুদিয়ালী স্কুল। সম্ভবত ত আগে ১৮৪১ সালে একটি পাঠশালা আকারে এর সূচনা হয়েছিল। ১ সালে তৈরি হয় মুদিয়ালী লাইব্রেরি। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত মোট ১২

বিভিন্ন স্তরের স্কুল তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে বাংলা ৬৮টি, উর্দু ২১টি, হিন্দী ১৯টি, ওড়িয়া ২টি, তেলেগু ১টি, ইংরেজি ৮টি, বাংলা-হিন্দী মিশ্র ২টি, উর্দু-হিন্দি মিশ্র ৩টি। প্রায় চল্লিশ হাজার ছাত্রছাত্রীর পঠনপাঠন এখানে চলছে। উর্দু সহ মোট ৮টি লাইব্রেরি এখনও পর্যন্ত চালু রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বহু ক্ষুদ্র-পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ এখানে নেওয়া হয়েছে। ইদানিং তার প্রকাশ বেশ কিছুটা কম। তবে বাঙালি মুসলমান সমাজের মধ্যে ১৯৯০-এর দশকে বেশ কিছু ক্ষুদ্র-পত্রিকার উদ্যোগ দেখা গেছে। প্রকাশনা অনিয়মিত হলেও, এইসব পত্রিকায় লক্ষ্য করা গেছে, স্থানীয় সংস্কৃতি-ইতিহাসকে খোঁজার এক আন্তরিক চেষ্টা। লক্ষ্য করা গেছে, নিজের কৌমসমাজের প্রতি একধরনের আত্মসমালোচনা। বদরতলা অঞ্চলে এইসব চর্চার রেওয়াজ তুলনামূলকভাবে বেশি। বদরতলা পাবলিক লাইব্রেরি গত চারবছর যাবৎ একটি নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা সফলভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত চেষ্টার মধ্যে দিয়ে যেন মেটিয়াব্রুজের তিনশতকের কৌমসমাজ গ্লোবালাইজেশন এবং টাকার দৌরাত্মের ঝাপটা বাঁচিয়ে নিজের অস্তিত্ব জাহির করে চলেছে।

গ্লোবালাইজেশন এবং পুঁজির দৌরাত্ম এখানে এসেছে জনজীবনের এক লাগাতার সঙ্কটের হাত ধরে। তার অন্যতম প্রকাশ, কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া। ১৯৭০-এর দশকে প্রথম চিরতরে বন্ধ হয় পাহাড়পুর রোডে ঢোকার মুখেই বার্মা লাইম ফ্যাকট্রি। তারপর শুরু হল ক্রনিক রোগের মত কেশোরাম সুতাকলের ক'বছর অন্তর বন্ধ হওয়া। এই ঘটনার পাশাপাশি দর্জি শিল্পে দুই দশক আগে এলো ব্যবসার জোয়ার। বৃটিশ আমলের অর্ডারি কাজের বদলে চালু হয়েছিল রেডিমেড কাজ। তৈরি হল সারি সারি মার্কেট। খোদ বড়বাজার উঠে এলো দর্জিপাড়ায়। দর্জি পাড়ায় নতুন করে জন্ম নিল মার্কেট নিয়ে কেলেঙ্কারি। পুরাতন ভাড়াটেদের তোলার জন্য দাদাবাহিনীর আবির্ভাব। শুরু হল তোলা আদায়। গড়ে উঠলো মার্কেট ঘিরে চক্র। পুরনো কৌমসমাজের মধ্যে টাকাওয়ালাদের আবির্ভাবে নতুন টানাপোড়েন তৈরি হল। আধ-মানুষ পর্দা টাঙিয়ে দহ্লিজে দিনভর কাজ চলে। সেই তৈরি জামাকাপড় ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশের বাজারে। বটতলা ঘিরে পুরনো বৃত্তটা বড় হতে থাকে। বাঙালি মুসলমান বসতির মধ্যে চটা, মগরাহাট, বুনোর হাট, সরিষাহাট, পৈলান, ডায়মন্ডহারবার, রায়পুর, আসুতি, মাশগড়ে ঘরে ঘরে মেশিন চলছে। মেটিয়াব্রুজের ওস্তাগরের কাজ নিয়মিত তুলে দিচ্ছে ঐসব পাড়ার মানুষ। এমনকী, চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, মেদিনীপুরেও ছড়িয়েছে এই কাজ। কেন্দ্রটা রয়ে গেছে সেই বটতলায়।

কিন্তু এই বৃদ্ধিও আজ যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। দর্জি পাড়ায় কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, বাজার খারাপের কথা। অনেক ক্ষেত্রে মাসের পর মাস কাজ নেই। বিশ্বপুঁজির যাদুছোঁয়ায় বৈভব আর দারিদ্র এসেছে হাত ধরে। বস্তির ঘর ঘর থেকে কাতারে কাতারে মানুষ আগে ঢুকতেন বড় বড় কারখানার হাঁ-এর মধ্যে। এখন সে জনস্রোত ফিকে হয়ে এসেছে। কাতারে কাতারে মানুষ বসে পড়ছেন রাস্তার পাশে — ফল, সবজি আর যা-কিছু নিয়ে বেচবার জন্য।

ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন আজ অনেকখানিই স্তিমিত। ঈদ, দুর্গাপুজো বা জগদ্ধাত্রীপুজোর উৎসবে স্বতস্ফূর্ত আনন্দকে ছাপিয়ে যেন মাথাচাড়া দিচ্ছে একধরণের 'লড়ে যাবো' মনোভাব। নিজের নিজের কৌম-পরিচয় যেন এক বিকৃত পথে মরীয়া লড়াইয়ে শামিল হতে চাইছে। সেই লড়াইয়ের ফয়দা নিতে চাইছে অর্থ পিশাচ দুর্বৃত্তরা। এসব হৈ-চৈ, ঝুট-ঝামেলা এড়িয়ে থাকতে চান অনেক অনেক মানুষ। কিন্তু পালাবার পথ কই?

তথ্যসূত্র ঃ

১। ইতিহাস ও ঐতিহ্য ঃ মেটিয়াবুরুজ; সুলতান আহ্মেদ, মুদিয়ালী লাইব্রেরি শতবর্ষ স্মরনিকা।
২। মুদিয়ালী পঞ্চানন্দ দেবের ইতিবৃত্ত; কানাইলাল ঘোষ, ঐ।
৩। বদরতলা সংস্কৃতি সমন্বয় ক্ষেত্র; তাপস সরদার, সপ্তপর্ণী (বদরতলা পাবলিক লাইব্রেরি), ১ম সংখ্যা, ১৪০৪।
৪। বদরতলা লোককবি গুণকবি গুরুদাস পাল; তাপস সরদার, ঐ, নববর্ষ সংখ্যা, ১৪০৭।
৫। শিক্ষাসহ এলাকার কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়, মহম্মদ আমিন, কথা-কবিতা, ১৯৯৭।
৬। দর্জিপাড়ার করিম ওস্তাগর; আলিফ নবী ওমর, ঝিনুক, ঈদসংখ্যা, ১৯৯৮।
৭। চব্বিশ পরগণা ঃ উত্তর, দক্ষিণ, সুন্দরবন; কমল চৌধুরী, ১৯৯৯।
৮। জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা; পশ্চিমবঙ্গ, ১৪০৬।
৯। রুনুবান্ধব, সোমনাথ লাহিড়ী রচনাবলী (১৯৩১-১৯৪৫)।

আসগর আলি ইঞ্জিনীয়ার এবং মুসলমান সমাজে একটি আদর্শ নিকাহ্নামার জন্য লড়াই

৩১শে অক্টোবর ২০০০ আমরা 'দ্য হিন্দু' পত্রিকায় আসগর আলি ইঞ্জিনীয়ারের প্রবন্ধ 'হোপ্স ফর চেঞ্জ' থেকে বিষয়টি জানতে পারি। ২৯শে অক্টোবর 'মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড' তাদেরই বিশেষ সাব-কমিটির তৈরি আদর্শ নিকাহ্নামার খসড়া নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত হতে পারে নি।

আসগর আলি ইঞ্জিনীয়ার রক্ষণশীল বোহ্রা মুসলমান সমাজের মানুষ। ঐ কৌমের প্রধান সৈয়দানা মহম্মদ বুরহানুদ্দিনের ধর্মের নাম করে স্বার্থসিদ্ধির বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার। পাঁচবার মৌলবাদীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন কলকাতা, হায়দ্রাবাদ, কায়রো এবং সর্বশেষ মুম্বাইতে। সমস্ত ধরণের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতা এবং মুসলমান সমাজের সংস্কার — দুই লড়াই তিনি একই সঙ্গে চালাচ্ছেন।

মুসলমান সমাজের মধ্যে কিছু মহিলা এই আদর্শ নিকাহ্নামার দাবি তোলেন। বিবাহের সময় স্বামী এবং স্ত্রী একটি আদর্শ নিকাহ্নামার দ্বারা চুক্তিবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি তাঁরা দাবি করেন। ইসলামের আদর্শ অক্ষুণ্ন রেখে বিবাহ, বহুবিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ সহ দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন বিষয়গুলিকে একটি খসড়াতে লিপিবদ্ধ করেন সেই মহিলারা। সেই খসড়া 'মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড'-এর হাতে বিবেচনার জন্য দেওয়া হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে 'মন্থন সাময়িকী' পত্রিকা থেকে আসগর আলি ইঞ্জিনীয়ারকে পাঠানো চিঠি ও তার জবাব বাংলা তর্জমা করে ছাপানো হল।

মাননীয়,
আসগর আলি ইঞ্জিনীয়ার

আমি আপনার বই "দ্য কোরান, উইমেন অ্যাণ্ড মডার্ন সোসাইটি" সম্প্রতি পড়েছি। আমরা এই বইয়ের একটি পরিচিতি আমাদের পত্রিকায় প্রকাশ করছি। এই বিষয়ে সাম্প্রতিক তথ্য ও আপনার মন্তব্যগুলি জানতে পারলে ভাল হয়। আমরা জানতে চাই, সাধারণভাবে মুসলমান সমাজে এবং বিশেষভাবে মহিলাদের মধ্যে 'নিকাহ্নামা'-র সম্মতি/অসম্মতি কিভাবে রয়েছে। আপনার পত্রিকা সম্পর্কেও জানাবেন।

ধন্যবাদ সহ,
জিতেন নন্দী
সম্পাদক, মন্থন সাময়িকী

জিতেন নন্দী সমীপে,

আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ নেবেন। আমি সম্পূর্ণত নিকাহ্নামার পক্ষে। এটা মুসলমান মহিলাদের পক্ষে সহায়ক হবে। কিন্তু মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড সুগ্রথিত নিকাহ্নামা গ্রহণ করতে চায় না। তাঁরা মনে করেন এটা গৃহীত হলে মহিলাদের বড় বেশি ক্ষমতা দেওয়া হবে। কিন্তু আমরা এর সম্মতির জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। যতক্ষণ তা না হচ্ছে আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।

আসগর আলি ইঞ্জিনীয়ার